সিনেমার গল্প
গল্পের সিনেমা

১ম খণ্ড

সংকলন ও সম্পাদনা
বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

অ্যালবাম ২৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পোস্টমাস্টার (তিন কন্যা) ৪৯
কাবুলিওয়ালা ৫৩
সমাপ্তি (তিন কন্যা) ৫৯
অতিথি ৭২
মণিহারা (তিন কন্যা) ৮৪
নষ্টনীড় (চারুলতা) ৯৪
স্ত্রীর পত্র ১৩০
ক্ষুধিত পাষাণ ১৪১
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ১৪৯
দালিয়া ১৫৫
জীবিত ও মৃত ১৬২
মেঘ ও রৌদ্র ১৭১
বিচারক ১৮৮
নিশীথে ১৯৩
মানভঞ্জন ২০২

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গুপী গাইন ও বাঘা বাইন ২০৯

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভাগীর স্বর্গ ২২০
আঁধারে আলো ২২৭
সতী ২৪০
ছবি ২৫১
মামলার ফল ২৬৩
হরিলক্ষ্মী ২৭৩
পরেশ ২৮৫
মন্দির ২৯৩
অনুরাধা ৩০৪
বিন্দুর ছেলে ৩২৬
রামের সুমতি ৩৫৯
মেজদিদি ৩৮৩
দর্পচূর্ণ ৪০২
কাশীনাথ ৪২৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রসময়ীর রসিকতা ৪৪৬
দেবী ৪৫৯
নিষিদ্ধ ফল ৪৬৮

লেখক পরিচিতি ৪৮০

ভূমিকা

২০১৩ সালের ৩ মে ভারতীয় সিনেমা ১০০ বছরে পা দিল। তাই, দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ভারতীয় সিনেমার শতবর্ষ। ঠিক ১০০ বছর আগে এই দিনটিতে মুক্তি পেয়েছিল 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে এই ছবি তৈরি করে দেশে হইচই ফেলে দেন ফালকে। ১৯১৩ সালের ২১ এপ্রিল, মুম্বইয়ের অলিম্পিয়া থিয়েটারে এই ছবির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। রীতিমতো কার্ড ছাপিয়ে সমাজের বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছবি দেখিয়েছিলেন দাদাসাহেব। ছায়াছবিটি সাধারণ দর্শকদের জন্য দেখানো হয়েছিল মুম্বই-এর করোনেশন থিয়েটারে, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে। চলচ্চিত্রটির পরিচালক ও প্রযোজক ছিলেন শ্রীঢুন্ডিরাজ গোবিন্দরাম ফালকে। ৩ মে যখন সাধারণ দর্শকের জন্য সিনেমাটি রিলিজ করা হয়, সকলে চমকে গিয়েছিলেন। মুম্বইয়ের করোনেশন থিয়েটারে টানা ২৩ দিন এই ছবি চলার পর এতটাই প্রশংসিত হয়েছিল যে, ফালককে পরে হলের সংখ্যা বাড়াতে হয়। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'-এর জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ছবির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫০ মিনিট। আর এটি তৈরি করতে ফালকের সময় লেগেছিল প্রায় আটমাস। কারণ ভারতীয় কলাকুশলী ছাড়া আর অন্য কারও সাহায্য নেননি তিনি। এখানে শুধু পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করেছিলেন। মহিলা অভিনেত্রী পাওয়া যায়নি, কারণ মেয়েদের সিনেমা বা থিয়েটারে অভিনয় করা তখন ভালো চোখে দেখা হত না। যাই হোক, অন্না সালুঙ্কে নামক এক হোটেলের কুককে খুঁজে বের করা হয়েছিল, যিনি 'রানী তারামতী'র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আর রাজা হরিশচন্দ্রের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তখনকার দিনের জনপ্রিয় মারাঠি স্টেজ অ্যাক্টর, ডি ডি ডাবকে। জনপ্রিয় পেন্টার রাজা রবি ভর্মার ছবির খুব বড়ো ভক্ত ছিলেন দাদাসাহেব। তাই ছবিতে তাঁর অঙ্কিত চিত্রও ব্যবহার করা হয়। যাই হোক, দাদাসাহেবের সেই সময়ের পরিশ্রমের ফলই এখন ভোগ করছে ভারতীয় সিনেমা। ১০০ বছরের জন্মদিন পূর্ণ করেও, এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। সেই হিসেবেই ২০১৩-র ৩ মে পূর্ণ হল ভারতীয় সিনেমার শতবর্ষ। সেই প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক দিক থেকে 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' প্রথম ভারতীয় কাহিনিচিত্রের মর্যাদাপূর্ণ আসনটির অধিকারী।

তবে এই সন-তারিখ নিয়ে চলচ্চিত্র-গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট তর্ক আছে। তর্ক আছে ইতিহাস সচেতন প্রবীণ সিনেমাপ্রেমী মানুষদের মধ্যেও। অনেকেই মনে করেন, কলকাতার শ্রী হীরালাল সেন মহাশয়, আরও দশ বছর আগে, মানে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে 'আলিবাবা ফরটি থিভস্' শিরোনামাঙ্কিত একটি সিনেমা বানান। বাজির কারখানার বিধ্বংসী আগুনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সব ভস্মীভূত। তবে সমকালের দৈনিক কাগজে এই চলচ্চিত্রটির বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। সে চলচ্চিত্রটির প্রমাণহীনতায় অগত্যা ডি জি ফালকের কাজকেই সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

নির্বাক যুগের ছায়াছবি থেকেই আমরা দেখে আসছি সাহিত্য নির্ভরতা। চলচ্চিত্র-নির্মাণের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯১৩-র ৩ মের পর ওই একই বিষয় নিয়ে ১৯১৭-তেও নির্মিত হয় একটি নির্বাক চলচ্চিত্র। তার শিরোনাম 'সত্যবাদী রাজা হরিশ্চন্দ্র'। ইতিহাস থেকে জানা যায়, 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' (১৯১৩)-র নেগেটিভ পুড়ে যাওয়ায়, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সেই ছবির রিমেক তৈরি হয়। তখন তার নামকরণ করা হয় 'সত্যবাদী রাজা হরিশ্চন্দ্র'। পাঁচ রিলের সেই ছায়াছবিটির প্রোডিউসার ছিলেন Elphinstone Bioscope Company। পরিচালক রুস্তমজী ধোতি ওয়ালা। চিত্রনাট্য লেখেন নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন। চিত্রগ্রাহক ছিলেন জ্যোতিষ সরকার। নিউ টেস্ট ময়দানে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯১৭-র ২৪ মার্চ। মজার ব্যাপার হল, ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত দাদাসাহেব ফালকে যে ছবিগুলি তৈরি করেছিলেন, তা সে 'মোহিনী ভস্মাসুর' হোক, 'সত্যবতী সাবিত্রী', 'লঙ্কা দহন' বা 'কালীয় মর্দন', সে সবকটির বিষয়ই ছিল পুরাণ থেকে তুলে আনা। আর এর পিছনে কারণ ছিল একটাই। পুরোপুরি বিদেশি একটি মাধ্যমকে আত্মস্থ করে তাকে সম্পূর্ণরূপে 'দেশজ' করে তোলা। একমাত্র এই কারণেই ফালকের তখন পৌরাণিক বিষয়গুলিকে তুলে আনার দরকার হয়েছিল। এই ছবিগুলিতে ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, ভারতীয় টেকনিশিয়ানদের নিয়ে

প্রকারান্তরে কিন্তু 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনেই মদত দিয়েছিলেন দাদাসাহেব। আর তাই ১৯১০ সালে তাঁর দেখা একটি বিদেশি ছবি 'দ্য লাইফ অফ ক্রাইস্ট'-ই পরে তাঁর পরিচালনায় হয়ে যায় 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম'! সেই সময় বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ফালকের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'র তারা ভূয়সী প্রশংসা করে। ছবি নিয়ে তাদের রিভিউ ছিল, 'অ্যান এন্টায়ারলি ইন্ডিয়ান প্রোডাকশন বাই ইন্ডিয়ানস!' তবে ফালকের 'লঙ্কাদহন' ছিল প্রথম ভারতীয় বক্স অফিস হিট! কীভাবে সীতাহরণ হল, তা রাবণ নিজের মুখে শোনাচ্ছেন, এটাই ছিল ছবির গল্প। ছবিটি দেখানোও হয়েছিল ভারী অদ্ভুত সময়ে। মুম্বইয়ের একটি থিয়েটারে সকাল সাতটা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত চলে ছবিটি।

এই দশকে নির্বাক ছবির সংখ্যা হঠাৎ করেই বেশ বেড়ে গিয়েছিল। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার হল, এই সময়টি বাংলা ছবির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একদিকে হিন্দি ছবি যখন 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর বিভিন্ন অংশ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বেশি ছবি তৈরি করছে, তখন বাংলায় নীতিশ লাহিড়ি নামের এক পরিচালক ১৯২১ সালে 'বিলাত ফেরত' নামে একটি প্রেমের ছবি পরিচালনা করে হইচই ফেলে দেন! এটিকেই ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রথম প্রেমের ছবি হিসাবে ধরা যেতে পারে। তবে এই দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বোধহয় 'ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি'র নিজস্ব আলাদা একটি পরিচয় তৈরি করতে সক্ষম হওয়া। সারা বিশ্ব তখন ভারতীয় ছবিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল বলেই, সেই সময় ১৯২৫ সালে 'প্রেম সন্ন্যাস' ছবিটি ইন্দো-ইউরোপীয় যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হয়। জার্মান টেকনিশিয়ান এবং ভারতীয় অভিনেতারা একসঙ্গে এই ছবিতে কাজ করেছিলেন। তখনকার দিনের নামি অভিনেত্রী দেবিকা রানি এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন এবং নিজের হাতে এই ছবির সেটও তৈরি করেছিলেন।' ["চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ", পৌলোমী সেনগুপ্ত সম্পাদিত বিশেষ সংখ্যা 'আনন্দলোক', ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে উদ্ধৃত।]

বাংলা নির্বাক ছবির যাত্রা শুরু হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ১৯১৯ সালের ৮ নভেম্বর 'বিল্বমঙ্গল' ছবিটি দিয়ে বাংলা ছবি পথ চলা শুরু করে। মানে, 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' মুক্তি পাওয়ার ঠিক ছ বছর পর। ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানি অফ ক্যালকাটা প্রযোজিত এই পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবিটির পরিচালক ছিলেন রুস্তমজী ধোতিওয়ালা। কর্নওয়ালিস থিয়েটারে এই ছবি দেখানোর মাধ্যমে শুরু হয় বাংলা ছবির ঐতিহাসিক যাত্রা। তারপর থেকে বাংলায় নির্বাক ছবির ধারা থেমে থাকেনি। ১৯২০ তে 'মহাভারত', 'ধ্রুবচরিত্র', 'মা দুর্গা'; ১৯২১ সালে 'বালিকা বধূ', 'বিষ্ণু অবতার', 'ডাব্বুর কেলেঙ্কারি'ই হোক বা 'নল দময়ন্তী' অথবা 'শিবরাত্রি' বিভিন্ন বিষয়কে উপলক্ষ্য করে ছবি তৈরি হয়েছে লাগাতার। তবে মজার ব্যাপারটা হল, সেই সময় হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে পৌরাণিক বিষয়ের ওপর ছবি তৈরির আধিক্য দেখা গেলেও, বাংলায় তেমনটা দেখা যায়নি। আর সেই কারণেই ১৯২১ সালে নীতিশ লাহিড়ি পরিচালিত 'বিলাত ফেরত' ছবিটিকে ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে একটা অন্য জায়গা দেওয়া যেতেই পারে। কারণ এই ছবিটিই হয়তো ভারতে প্রথম 'প্রেমের ছবি।'

হতে পারে, হিন্দির চেয়ে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বেশ খানিকটা পিছিয়ে শুরু করেছে, কিন্তু কীর্তির দিক থেকে কখনোই পিছিয়ে ছিল না। ১৯২৪ সালে এখানেই তৈরি হয় প্রথম সিরিয়াল ছবি 'পত্নী প্রতাপ'। আর ১৯২৬ সালে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'শিবরাত্রি' ছবিতে বাংলা ভাষার নায়ক-নায়িকার পরিচিতি লেখা হয়। লেখার কাজটি করেছিলেন অমর চৌধুরী। যাই হোক, সাহিত্য নির্ভর ছবির সাক্ষী কিন্তু এই দশকই।'

১৯২২-এ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে শিশির ভাদুড়ীর চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় (সঙ্গে ছিলেন নরেশ মিত্র) নির্বাক ছায়াছবি হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল 'আঁধারে আলো'। ছয় রিলের এই সাদা-কালো ছবিটির প্রোডিউসার ছিলেন 'তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি'। চিত্রগ্রাহক ননীগোপাল সান্যাল। অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, দুর্গারানী, লীলা দেবী ও কঙ্কাবতী দেবী। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল মনোমোহন থিয়েটারে। ১৯২২-র ২০ সেপ্টেম্বর। ওই বছরই ২২ এপ্রিল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে 'বিষবৃক্ষ' নামের ছায়াছবিটি মুক্তি পেল জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। তাতে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯২৩-এর ১৮ জুন মুক্তি পেল নরেশ মিত্রের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানভঞ্জন'। ১৯২৬-এর ১০ অক্টোবর প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মুক্তি পেল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। ১৯২৭-এর ৩ ডিসেম্বর ওই একই পরিচালকের হাতে মুক্তি পায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। জয়গোপাল পিল্লাই-এর পরিচালনায়

১৯২৭-এর ২৬ নভেম্বর মুক্তি পায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'পুনর্জন্ম'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'নিষিদ্ধ ফল' মুক্তি পায় ১৯২৮-এর ২৮ জুন, কালিপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সরলা' মুক্তি পেল প্রিয়রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ১৯২৮-এর ১ সেপ্টেম্বর। ওই বছরই পরিচালক নরেশ মিত্র হইচই ফেলে দিলেন শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-কে সিনেমায় এনে। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পটি পরিচালনা করলেন শিশির ভাদুড়ী (১৯২৯-এর ১২ মার্চ)। ওই একই বছরে মুক্তি পেল বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' (পরিচালক : জ্যোতিষ গঙ্গোপাধ্যায় ; ১৪ ডিসেম্বর), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (ওই একই পরিচালক; ৯ ফেব্রুয়ারি), 'কপালকুণ্ডলা' (পরিচালক : প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়; ১৩.০৪.১৯২৯) এবং 'রজনী' (পরিচালক : জ্যোতিষ গঙ্গোপাধ্যায়; ১৪. ১২.১৯২৯)।

১৯৩০-এ মধু বসুর পরিচালনায় মুক্তি পেল (২৬ জুলাই) রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পটি। ওই একই পলিচালক রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র'-র কাহিনি অবলম্বনে নির্মাণ করলেন 'গিরিবালা' (১৫ ফেব্রুয়ারি)। ওই বছরই জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মুক্তি পেল বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' (২৭ ডিসেম্বর); 'রাধারাণী' (৮ মার্চ) ও 'রাজসিংহ' (৬ সেপ্টেম্বর)। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে বিমল পাল পরিচালনা করলেন 'পিয়ারী' (১৬ ফেব্রুয়ারি)। ১৯৩১-এ মুক্তি পেল (৯ মে) ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'। প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'চাষার মেয়ে' (৪ সেপ্টেম্বর), চারু রায়ের পরিচালনায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চক্রান্ত' (৩ এপ্রিল) এবং শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' (১১ জুলাই) মুক্তি পেল। প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' (১১ জুলাই), প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'সহধর্মিনী' নিয়ে ছায়াছবি নির্মাণ করলেন অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩২-এ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সন্দিগ্ধ' ও 'নিশির ডাক' কাহিনি দুটি মুক্তি পেল প্রফুল্ল রায় (১২ মার্চ) ও দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় (২৩ এপ্রিল)।

রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাস নিয়ে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯ জুলাই) ও রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' অবলম্বনে নরেশ মিত্র ছায়াছবি নির্মাণ করলেন (৩ জুন)।

ওই বছরেরই ১০ মার্চ ও ১৯৩৪-এর ১৫ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেল শেষ আর দুটি নির্বাক ছায়াছবি। 'শক্তিপূজা' ও 'নিয়তি'।

নির্বাক যুগের ছায়াছবি সূচনার পর-পরই পরিচালকগণ একের পর এক, প্রায় সব চলচ্চিত্রের কাহিনিই নির্বাচন করলেন ধ্রুপদি সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস থেকেই। আর সবাক যুগের ছায়াছবি শুরুই হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে। সেটা ছিল ১৯৩৯-এর ৩০ ডিসেম্বর। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' মুক্তি পায় 'অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন হাউস'-এ। বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র এটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দিতেও প্রথম সবাক ছবির মুক্তির সাল ছিল ১৯৩১। '১৯৩১ সালে প্রথম সবাক ছবি আলম আরা'র সময়টি। আরদেশির ইরানি পরিচালিত এই ছবির রিলিজ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মোড় ঘোরানো একটি মুহূর্ত। কারণ, এই ছবির পাশাপাশি বাংলায় 'জামাই ষষ্ঠী', তামিলে 'কালিদাস' এবং তেলেগুতে 'ভক্ত প্রহ্লাদ'-এর মতো টকিও (TALKIE) মুক্তি পায়। তবে, হিন্দিতে প্রথম 'টকি' নাকি আসলে কোনো সিনেমা নয়। সেটি ছিল, খাদি শিল্পের একটি বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনে মহাত্মা গান্ধি এবং কস্তুরবা গান্ধি নাকি গলা দিয়েছিলেন। মজাটা হল, 'আলম আরা' সবাক ছবি হলেও, তাতে নায়কের মুখে একটি সংলাপও ছিল না। যাই হোক, তখন বেছে-বেছে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজে নেওয়া হত, যাদের গলার স্বর যথাক্রমে দাপুটে এবং সুরেলা। ...'কর্মা' (১৯৩৩) নামের হিন্দি টকিতে অভিনেত্রী দেবিকা রানি একটি চার মিনিটের চুম্বনদৃশ্যে অভিনয় করেন, যাতে পুরো ইন্ডাস্ট্রি নড়েচড়ে বসে। ...এত রকমের বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও, ছবিটি খুব ভালো ব্যাবসা করতে পারেনি। ...এই দশকের মাঝামাঝি সময়েই বোঝা যায়, নায়ক-নায়িকা চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য গান জানাটা বাধ্যতামূলক নয়। ফলে প্লেব্যাক সিঙ্গারদের দিয়ে গান গাওয়ানো শুরু হয়। ১৯৩৫ সালে নিজের ছবি 'ধূপ-ছাঁও'তে প্রথম প্লেব্যাক সিঙ্গার আমদানি করেন নীতিন বসু। এই ছবিতে সুর দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল।...এই দশকেই প্রথম 'রঙিন' ছবি

চাক্ষুষ করে ভারতীয় দর্শক। সৌজন্যে, আবার সেই আরদেশির ইরানি। তাঁর 'কিষাণ কন্যা' (১৯৩৭) নামের ছবিটি পুরোটাই ভারতে তৈরি হয়েছিল। তবে ওই বছরই 'সন্ত তুকারাম' (মারাঠি) তৈরি করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন বিষ্ণুপন্থ গোবিন্দ দামলে এবং শেখ ফতেলাল। ভেনিস ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই ছবিটি প্রদর্শিত হয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ছবি নতুন রূপে পৃথিবীর সিনেমা মানচিত্রে উঠে আসে।' ["মোড় ঘোরানো মুহূর্ত", বিশেষ সংখ্যা 'আনন্দলোক'; ডিসেম্বর, ২০১৩]

'দেনাপাওনা' ছবিটির চিত্রগ্রাহক ছিলেন নীতিন বোস। সংগীতে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল ও নৃপেন মজুমদার। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন উমাশশী। অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, কুসুমকুমারী, নিভাননী দেবী, উমাশশী, শশিবালা, অনুপমা দেবী ও আভাবতী।

কিন্তু 'অনেকে মনে করেন, বাংলায় সবাক ছবির ধারা শুরু হয়েছিল 'জামাইষষ্ঠী' ছবিটি দিয়ে। হ্যাঁ, ঠিকই, কিন্তু আংশিক। ইতিহাস বলছে, বাংলায় সবাক চিত্রের শুরু হয় ১৯৩১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'জয় জয় ভবানীপতি' গানটি দিয়ে। মুন্নি বাঈয়ের গলায় এই গানটি সেবার ক্রাউন সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল। বলাবাহুল্য, হিন্দি ছবি সবাক হওয়ার বছরে বাংলা ছবিরও 'সবাক' হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে বড়ো ব্যাপার। তবে 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তির আগে আরও একটি ব্যাপার ঘটে। ১৩ মার্চ ক্রাউন সিনেমা হলেই সেই সময়কার হিট কিছু নাটকের প্রায় ৩০-৪০টি দৃশ্য বাক সংযোজিত হয়ে মুক্তি পায়। এই নাটকের মধ্যে ছিল অহীন্দ্র চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কণ্ঠস্বর। তারপর তো 'জামাই ষষ্ঠী' এসে বাংলা ছবির মোড়ই ঘুরিয়ে দেয়। সেখান থেকে 'দেনাপাওনা'।...তারপর 'প্রহ্লাদ', 'লায়লা-মজনু' একের পর এক মুক্তি পেতে থাকে। তখন নিউ থিয়েটার্স ও ম্যাডান থিয়েটার বেশ কিছু ছবি প্রযোজনাও করে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নটীর পূজা'র নাম না করলেই নয়। কবিগুরুর এই সৃষ্টির সার্থক রেকর্ড করা হয় শান্তিনিকেতনের একটি অনুষ্ঠানে। তারপর রিলিজ করা হয়। এরপর 'চিরকুমার সভা', 'পল্লীসমাজ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'...সাহিত্যধর্মী ছবির যেন হিড়িক পড়ে যায়। তবে সুবিধেটা হল, এইসময় বেশ কয়েকজন ভালো কলাকুশলী পায় বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে কানন দেবী, দেবকী বসু, কে এল সায়গল, নীতিন বসু, বিমল রায়, পঙ্কজ মল্লিক, সক্কলে যেন এককাট্টা হয়ে বাংলা সিনেমার উন্নতির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। আর সেই লড়াই যে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, তা বোঝা যায় ১৯৩২ সালেই। এই বছরই দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস' ছবিতে সাউন্ড রেকর্ডিং এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের দুর্দান্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৫ সালে 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে তো প্লেব্যাক সিঙ্গার এনে আলোড়নই ফেলে দিয়েছিলেন নীতিন বসু (ওই বছরই এই ছবির রিমেক হয় 'ধূপ ছাঁও' নামে। নীতিন বসুই তৈরি করেন)। আসলে সেই সময় পৌরাণিক বিষয়ের পাশাপাশি চারপাশের সমাজ, মানুষের জীবন-যাপনের কথা, দেশপ্রেমের বার্তা, সবই তুলে আনা হচ্ছিল সিনেমায়। সেই কারণেই 'দিদি' (১৯৩৭), 'জীবন-মরণ' (১৯৩৮), 'দেশের মাটি' (১৯৩৮) মানুষের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। ছবি নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরুর কথা বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিই ভেবেছিল। না হলে, প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' (১৯৩৭) ছবিটির আউটডোর শুটিং করা সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়, স্বামী-স্ত্রী জুটি মধু এবং সাধনা বসুও তাদের 'আলিবাবা' (১৯৩৬) এবং 'রাজনর্তকী' ছবিতে মিউজিকাল অপেরা স্টাইল আমদানি করেন। এই দশক থেকেই তখনকার দিনের জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা সিনেমায় জড়িয়ে পড়তে থাকেন। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের হাতে বাংলা ছবি অন্য মাত্রা পায়। যদিও এত কিছু সত্ত্বেও বাংলা ছবি তখন খুব বেশি করে হলিউড দ্বারা প্রভাবিত ছিল।...একমাত্র 'বাঙালি' (১৯৩৭) ছবিটি ত্রুটিমুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল। তিনের দশকে বাংলা ছবি যথেষ্ট উন্নতি করে এবং প্রথম 'স্টার' হিসেবে উঠে আসেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁর হাত ধরেই মূলত বাংলা ছবিতে 'মেলোড্রামা' নামক জনপ্রিয় ধারার উৎপত্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব এই সময়কার ছবিতে খুব বেশি করেই পড়তে থাকে। ...এই পরিবর্তনের 'প্রতীক' হিসেবে যদি কোনোও ছবিকে ধরা যায়, তা হলে সেটি 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪)। এই ছবিতে তৎকালীন সমাজ এবং সামাজিক বার্তাই যেন প্রকট হয়ে উঠেছিল।...তবে এই দশকে সিনেমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যদের ফিল্মে যোগদান। সামাজিক সচেতনতা, স্বাধীনতা, এসবের লক্ষ্যে এঁরা

পোস্টমাস্টার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না— বলিত, 'কী গা বাবু, কেন ডাকছ।'

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে? সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি—একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটো ভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিত ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে, মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্র ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণির উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লির সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নানা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন— মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতা কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরোনো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে?

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, 'সে কী করে হবে।' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।'

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারিনি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।'

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না'– বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণির উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন– একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'– কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে– এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে– সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছি না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেকসময় ধমক দিয়া তাহার মুখ 'বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, 'বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?'

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। 'দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।'

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'বাবা, মা তোমার কে হয়।'

মনে মনে কহিলাম শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, 'মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর গে যা। আমার এখন কাজ আছে।'

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে 'আগডুম-বাগডুম' খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।'

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল– তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কীরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলিঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।